International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-VI, November 2021, Page No. 16-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v7.i6.2021.16-24

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত রূপ ও বাংলা উপন্যাসের মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগ: একটি বিশ্লেষণ

কল্পনা মজুমদার
গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর

Abstract

The feeling of Wonder is at the roof of all creation in the world. This feeling always wants to be expressed. The some can be said Bengali literature in the history of Bengali literature. We call the period from the thirteenth century to the eighteenth century as the middle ages. Notable among the medieval literatures are Baishnaba Padabali, Sahitya Mangal Kabya, Jibani Sahitya, Nath Sahitya Translation Sahitya Loko Sahitya. The earlies example of early medieval Bengali Literature is Sri Krishna Kirtan. Mangal Kavya covers a large part of medieval Bengali Literature. Another Mangal Kavya of medieval Bengali Literature is Dharmangal Charita Sahitya is Chaitanya Biographical poem. Modern day writers have applied medieval elements to their writing. We see this medieval application in Bankin Chandras Novel Kapal Kundala. Abhijit Sen, Mahasweta Devi, Amio Bhushan Mazumdhar in their writings we find the application medieval elements.

পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টির মূলে রয়েছে বিস্ময়বোধ। এই বোধ সর্বদাই ব্যক্ত হতে চায়। মানুষের সেই অনুভূতির ব্যাপ্তি বিশ্ব জোড়া। আমাদের মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেকথা বলা চলে। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। সাহিত্যের আদিমতম প্রকারভেদ হল কাব্য বা কবিতা।

বাংলা কবি সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্যে মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে আমরা মধ্য যুগ বলে অভিহিত করি মধ্যযুগের সাহিত্যগুলো মূলত: দেবর্নিভর। তবে মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বের সাহিত্যে আমরা মানবতার সুর শুনতে পাই। মধ্যযুগীয় সাহিত্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, জীবনী সাহিত্য, নাথ সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি। মধ্যযুগের সাহিত্যগুলোর পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরছি – আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। এই কাব্যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব রয়েছে। ভাগবত ও পুরাণের প্রভাবকে ও আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। এতে মোট তেরোটি খন্ড আছে। বড়ু চন্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যটি রচনা করেছেন। বসন্তরঞ্জন রায় বনবিষ্ণুপুরের কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। এটি ১৯১৬ সালে এটি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' থেকে প্রকাশিত হয়।

জন্মখন্ডে পুরাণের অবতারণা আছে। কংসের অত্যাচার থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। রাধা কৃষ্ণ নিজেদের স্বরূপ চিনতে পারেনি। শ্রীরাধা নপুংসক আইহনের স্ত্রী। কৃষ্ণ রাধাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। কৃষ্ণ তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু রাধা কিছুতেই তাতে সম্মতি দেয় না। তারপর বড়ায়ির মধ্যস্থতায় স্বরূপ জানতে পারেন কৃষ্ণ ইতিমধ্যে কংস কে হত্যা করার জন্য মথুরায় চলে যায়। তারপর রাধা বিলাপ করতে থাকেন। এমত অবস্থায় পুঁথির পাতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। উপন্যাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা ফুটে উঠেছে।

মধ্যযুগের একটি বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে মঙ্গলকাব্য। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল। মানুষ বিপদে আপদে দেবতার শরণাগত হয়। দেবদেবীর উৎস এইসব আধিভৌতিক ভয়-ভীতি থেকে। বিভিন্ন ধরনের ভয় থেকে পরিত্রান পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পরিকল্পনা করা হয়েছে। যেমন সাপের ভয় থেকে বাঁচবার জন্য মনসার উৎপত্তি। হিংস্র বন্যশ্বাপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য চণ্ডীর পরিকল্পনা। বসন্ত রোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শীতলার উৎপত্তি। বাঘের হাত থেকে বাঁচবার জন্য দক্ষিণ বাথের পরিকল্পনা প্রভৃতি।

মনসামঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসা। মনসা দেবীর উৎস নিয়ে নানা মতামত আছে তবে মনসা অনার্য মনসা উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। তবে মনসা অনার্য দেবী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মনসা কে আর্য সমাজের স্থান দেওয়ার জন্য তাকে পৌরাণিক শিবের মানুষ কন্যারূপে দেখানো হয়েছে। সে চণ্ডীর সঙ্গে প্রবল বিবাদে লিপ্ত হয়। চন্ডী রেগে গিয়ে মনসার একটি চোখ কানা করে দেয়। চাঁদবণিক সমাজের উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি। মনসা এই সমাজে তার পূজার স্বীকৃতি পেতে চায়। তাই নিম্নশ্রেণির রাখালদের মধ্যে প্রথমে তাঁর পূজা প্রচার করেন। তারপর ধীরে ধীরে চাঁদকে দিয়ে এই পূজা প্রচার করতে চান। চাঁদ শৈব সে কিছুতেই মনসার পূজা করতে চায় না। ফলে দেবীর কোপে তার ছয় পুত্রের মৃত্যু হয়। সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবে যায়। চাঁদ সর্বস্বান্ত হয়ে দেশে ফিরে আসেন। তারপর তার এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তিনি তার বিবাহ দেন। তিনি মনসার কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাঁতালি পর্বতে বাসর ঘর নির্মাণ করেন। কিন্তু সেই লোহার বাসর ঘরের সূক্ষ্ম ছিদ্র সম্পর্কে মনসা জানতেন। মনসা সেই ছিদ্রপথে কালনাগকে পাঠিয়ে দেন। কাল নাগের দংশনে লক্ষিন্দর এর মৃত্যু হয়। বেহুলা মৃত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য স্বর্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। কলার ভেলা ভাসতে থাকে। পথে নানা বেহুলা তার স্বামীর মৃতদেহ কলার মান্দাসে করে নিয়ে চলেন স্বর্গের উদ্দেশ্যে। পথে নানাবিধ বিপত্তি সত্ত্বেও সে স্বর্গে পৌঁছায়। নৃত্যগীতে পটিয়সী বেহুলা। তাই দিয়ে তিনি দেবতাদের তুষ্ট করেন। শিবের নির্দেশে স্বামীর প্রাণ ফিরে পান। কিন্তু একটা শর্ত ছিল। তাহল চাঁদকে মনসার পূজো করতে হবে। শেষ পর্যন্ত চাঁদ মনসার পূজো করতে বাধ্য হয়। বেহুলা লখিন্দর যথারীতি স্বর্গে ফিরে যান। মনসামঙ্গলের মূলগত কাহিনী এইরকম। কিন্তু বাংলাদেশের স্থানভেদে কাহিনীর মধ্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা যায়। বাংলা মঙ্গলকাব্যের তিনটি ধারা রাঢ়ের ধারায় কবি বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, সীতারামদাস প্রমুখ। অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের ধারায় কবি- নারায়ন দেব, বিজয় গুপ্ত। উত্তরবঙ্গের ধারায় তন্ত্র বিভূতি জগজ্জীবন ঘোষাল। এরা সকলেই মঙ্গল কাব্যের প্রথম দিকের কবি। মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিজয়গুপ্তের মনসা প্রবল ঈর্ষাকাতর :- বিজয় গুপ্তের মনসা চণ্ডীর প্রতি আক্রমণ করে

'বৈর নিপাতিয়া পদ্মা নেহালেকৌতুকে।
কালদন্ত উগারিয়া/ বিষ থুইল ঘামুখে।।

কালা বিষের জ্বালায় চন্ডী করে ছটফট।।
কাহার প্রানে সহিতে পারে মনসার ঘা।
বিষের জ্বালায় চন্ডী পোড়ে সর্ব্ব গা।।[১]

বিপ্রদাস পিপলাই এর মনসা বিজয় কাব্য টি তে বেহুলা, চাঁদ সদাগর ও সনকার চরিত্রগুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। চাঁদের বাণিজ্য প্রসঙ্গে পথঘাটের বর্ণনা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নারায়ন দেব একটু পৌরাণিক ঘেষা কবি। তিনি তার দেব খন্ডের উপাদান সংগ্রহ করেছেন বিভিন্ন পুরান ও মহাভারত থেকে। কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকেও উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

চন্ডীমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আত্মবিবরণীতে কবি জীবন সম্পর্কে বিবরণ আছে। কবির জীবন ও সমকালীন সময়ের রূপরেখাট ধরা পড়ে। মানসিংহের শাসনকালে মামুদ শরীফ ডিহিদার রূপে নিযুক্ত হন। তার অত্যাচারে কবি সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য হন। দামুন্যা গ্রামে ত্যাগ করার সময় পথে তাকে নানারকম বিপদে পড়তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রাহ্মণ ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়ের কাছে আশ্রয় লাভ করেন। কাব্য রচনার জন্য তিনি দৈবাদেশ পান। অন্যদিকে ছাত্র রঘুনাথ ও কাব্য রচনার জন্য তাকে অনুরোধ করে। চন্ডীমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় বাংলার সমাজ, রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে।

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের অপর একটি মঙ্গলকাব্য হলো ধর্মমঙ্গল। রাঢ় বাংলায় এর প্রবল প্রভাব ছিল। বৌদ্ধ ও পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের মিল রয়েছে। কিন্তু তিনি অন্ত্যজ ডোম পুরোহিতদের দ্বারা পূজিত হন। 'নগর পত্তন' অংশে আমরা সামাজিক চিত্র দেখতে পায়। নানা অন্ত্যজ শ্রেণীর পরিচয় ফুটে ওঠে

'ডোম হাড়ী শুঁড়ি বৈসে গড় বেড়ি,
বিশাল কোটাল কোল।
কিরাত প্রবল, রণশিঙ্গা মাদল,
নিনাদে নাগরা ঢোল।।'[২]

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনেকটা এই রকম - কর্ণসেনের পত্নী রঞ্জাবতীর। প্রজাপতির ভাই মহামদ। কর্ণসেন অপুত্রক ছিলেন। ভাই মহামদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অবর্তমানে রঞ্জাবতীরকে বিয়ে দেওয়া হয়। মহামদ কিছুতেই এই বিবাহ মেনে নিতে চায় না। তাই মহামদ কর্ণ সেনকে অপুত্রক বলে অপমানিত করে। এতে রঞ্জাবতী দুঃখ পায়।

সে তখন পুত্র কামনায় ধর্ম ঠাকুরের পূজা করতে শুরু করে। তিনি চাপায়ের ঘাটে শূলে ভর দিয়ে ধর্মঠাকুরের পুজো করেন। এর ফলে ধর্ম ঠাকুর সন্তুষ্ট হয়। ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় রঞ্জাবতীর প্রাণ ফিরে পান এবং পুত্র লাভের বর পান। কিছুদিন পর রঞ্জাবতীর একটি সন্তান হয়। ধর্ম ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে তার নাম রাখেন লাউসেন। রঞ্জাবতী কিছুদিন পর আরও একটি পুত্র সন্তান লাভ করেন। তার নাম কপূর সেন। কামরূপের রাজা লাউসেনের বীরত্ব দেখে তার মুগ্ধ হন। তারপর নিজ কন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিয়ে দেন। ধর্ম ঠাকুর নানাভাবে রঞ্জাবতীর স্বামী ও সন্তানদের উপর নিপীড়ন করতে থাকে। অভিশাপে মহামদ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। লাউসেনের দয়ায় ধর্ম ঠাকুর কুষ্ঠ থেকে মহামদকে মুক্ত করেন। ধর্ম ঠাকুর পূজা প্রচার লাভ করে।

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য টি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ভারতচন্দ্র যুগসন্ধিক্ষণে মঙ্গলকাব্যে মানবতার গুণ গাইতে শুরু করেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের পৌরাণিকঅন্ক 'চন্ডীমঙ্গল' কাব্যের অনুসারী। অন্নদামঙ্গলে লৌকিক অংশ দেখা যায়। সেখানে হরিহোড় কাহিনী রয়েছে। দেবী মুরিহোরকে বরদান করেন। কিন্তু আবার তিনি অন্যায় ভাবে হরিহোড়ের গৃহত্যাগ করেন। দেবী অন্নদার ভবানন্দ মজুমদারের গৃহের দিকে যাত্রা করে। এখানে ঈশ্বরী পাটনীকে তিনি ছলনা করেছেন। তার চাওয়ার সীমা অতিক্ষুদ্র। সে দেবীর কাছে শুধু সন্তানের নিম্নতম চাহিদাটুকু চেয়েছেন। তার সন্তান যেন দুধে-ভাতে বেঁচে থাকতে পারে। তৎকালীন সময়ের চিত্র এখানে ধরা পড়েছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে অর্থাৎ মধ্যযুগের একেবারে অন্তিম পর্যায়ে শাক্তপদাবলী এক বিশেষ স্থান লাভ করেছিল। এই শাক্তপদাবলী গুলির উৎস প্রধানত বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনা, ঋগ্বেদ ও চর্যাপদের সাধনতন্ত্র।

'প্রাচীনকাল থেকে এদেশ তন্ত্র প্রধান মাতৃকা
পূজার পীঠস্থান, উপরন্তু প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগের মধ্যদিয়ে মধ্যযুগ পর্যন্ত গোটা
ভারতবর্ষেই আদ্যাশক্তি ... চলে এসেছে।'[৩]

শাক্তপদাবলী গুলো গিরিরাজ, মেনকা ও গৌরীর সুখ-দুঃখের পাঁচালী। এই পদ গুলোর মধ্যে আগমনী ও বিজয়া গানগুলো শ্রেষ্ঠ। বছরে একবার গৌরী হিমালয়ের গৃহে আসেন। মা মেনকা গৌরীর জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন। এ যেন বাঙালি মায়ের প্রতিচ্ছবি। এই পদগুলোতে সমকালীন সমাজ চিত্র পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল চরিত সাহিত্য। চৈতন্য জীবনী কাব্য গুলো সন্ত সাধকদের সমপর্যায়ভুক্ত। বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতকে চৈতন্য জীবনকে কেন্দ্র করে এই জীবনী সাহিত্য প্রসার লাভ করেছিল। বাংলা ছাড়াও তৎকালীন সময়ে সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য জীবনী রচিত হয়েছিল। যেমন মুরারী গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম' পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' স্বরূপ দামোদরের কচড়া। বাংলায় রচিত সাহিত্য গুলো বাঙ্গালীদের অমূল্য সম্পদ। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থটি সমকালীন সমাজ তথা জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষজনের বাস ছিল। চৈতন্যদেব সকলকে প্রেমভক্তি দান করেছিলেন। তিনি মালি, গন্ধবণিক, তাম্বুলি, সকলের কাছে অনায়াসে গেছেন। ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফাগুন পূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। তার দিব্যকান্তি সকলের হৃদয় হরণ করেছিল। তিনি কৌতুক প্রিয় ছিলেন -

'বঙ্গদেশী বাক্য অনুসরণ করিয়া
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।[৪]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব এইসব ধর্ম প্রাধান্য লাভ করেছিল। বাংলাদেশ শৈবনাথ পন্থীদের প্রাচুর্য ঘটেছিল মধ্যযুগে। নাথ সাহিত্যের অন্তর্গত ছড়া, আখ্যান ও গানগুলি মধ্যযুগে বিশেষ স্থান করে নেয়। যদিও এগুলো বহুকাল ধরে লোকমুখে, ভাট মুখে প্রচারিত হয়ে আসছিল। এইসময় যোগীরা সাধন মার্গের পীঠ স্থানে ছিলেন -

'তারা নানা ধরনের যৌগিক তান্ত্রিক, রাসায়নিক, আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ভিষগ বিদ্যার সাহায্যে জড় দেহকে পরিশুদ্ধ বা পরিপক্ক করে তার সাহায্যে মোক্ষ মুক্তি নির্বাণ লাভের আকাঙ্খা করতেন। এরা দর্শন হিসেবে

পতঞ্জলি যোগ দর্শন এবং ক্রিয়াকর্ম হিসেবে তন্ত্র ও হঠযোগের সাহায্য নিয়ে পিণ্ড দেহকে দিব্যদেহে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।[৫]

নাথ সাহিত্যে দুটি কাহিনী দেখা যায়। একটি গোরক্ষ বিষয়ক অপরটি ময়নামতি গোপীচন্দ্র বিষয়ক। গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কদলী রাজ্যে প্রবেশ করেন। নারী সুখ ভোগ করতে থাকে। এমনকি তাঁর এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ তার গুরুকে এই অবস্থা থেকে সরিয়ে আনেন। গুরুকে এভাবে সত্যভ্রষ্ট থেকে ফিরিয়ে এনেছেন। এখানেই গোরক্ষনাথের সার্থকতা। এই কাহিনীতে কিছু অলৌকিক ঘটনা ও রয়েছে। এখানে গোরক্ষনাথের কর্তব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় কাহিনী ময়নামতি গোপীচন্দ্রের।

রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ এই কাহিনীর মূল অংশ। ময়নামতি স্বামীর অকাল মৃত্যু জানতে পারেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও স্বামীকে বাঁচাতে পারেন না। তার স্বামীর মৃত্যুর কয়েকদিন পর একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। এই পুত্রই গোপীচন্দ্র। অদুনা পদুনা নাম্মী দুই রাজকন্যা সঙ্গে গোপীচন্দ্রের বিয়ে দেন ময়নামতি। তিনি ছেলের ক্ষেত্রেও সেই অকাল মৃত্যু দেখেন। গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণই এই মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু গোপীচন্দ্র কিছুতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করে গোপীচন্দ্র বেঁচে যায়। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দ গ্রিয়ার্সন সাহেব রংপুর থেকে স্থানীয় গায়কদের কাছ থেকে সর্বপ্রথম গোপীচন্দ্রের গান সংগ্রহ করেন।

অনুবাদসাহিত্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ শাখা। মধ্যযুগে রামায়ণ অনুবাদ করেছেন কৃত্তিবাস ওঝা। এখানে সীতা বাল্মিকীরামায়ণের সীতা নয়। বাঙ্গালী নারীর মতোই সহনশীল এই সীতা। এখানে মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। কাশীরাম দাসের মহাভারত এর অনুবাদ আমাদের আপ্লুত করে। মধ্যযুগীয় সমাজচিন্তন এই মহাভারতের মধ্যে ফুটে উঠেছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস ছাড়া আরও অনেকে অনুবাদ সাহিত্য রচনা করেছেন। রামায়ণের অনুবাদ করেছেন দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ ঘনশ্যাম দাস, ভবানী দাস, দ্বিজ লক্ষণ প্রমুখ।

মহাভারতের অনুবাদ করেন দ্বিজ হরিদাস, ঘনশ্যাম, নিত্যানন্দ প্রমুখ ব্যক্তি।

বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিদের অবদান অনস্বীকার্য বিখ্যাত মুসলিম কবিরা হলেন দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান মহম্মদখান ও হাজি মহম্মদ। এরা সকলে সপ্তদশ শতকে বর্তমান ছিলেন।

দৌলত কাজীর 'লোর চন্দ্রানী' একটি রোমান্টিক কাব্য। দৌলত কাজী মিয়া সাধনের ' মৈনাকো সত্ কাব্য থেকে তিনি লোরচন্দ্রানী উপাদান সংগ্রহ করে অনুবাদ করেন। সৈয়দ আলাওল দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রানী বাকি অংশটুকু সমাপ্ত করেন।

তাছাড়া আলাউল ধর্মতত্ত্বের নানা গ্রন্থের অনুবাদও করেন। যেমন সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল তোহফা মধ্যযুগের গীতিকাগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই গীতিকাগুলো দীর্ঘ সময় ধরে মানুষের মুখে মুখে ফিরত। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এগুলোকে বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করেন। প্রথম খন্ডটি ময়মনসিংহগীতিকা। এই গীতিকায় নরনারীর বাস্তব জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। মহুয়া, মলুয়া, কমলা কঙ্ক; ও ভেলুয়া সুন্দরীর রোমান্টিক প্রেম কাহিনীর মধ্যে তৎকালীন দেশ, কাল সমাজ ব্যবস্থা ও বিধি-নিষেধ পরিস্ফুট হয়েছে। মানব প্রেমের মহিমা মৈমনসিংহ গীতি কাব্যের সাহিত্যিক মূল্য দান করেছে।

বাংলা সাহিত্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বর্তমানকালের অনেক ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে আমরা মধ্যযুগীয় উপাদান প্রয়োগ দেখতে পাই। বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকের উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তার কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)- উপন্যাসে আমরা মধ্যযুগীয় উপাদানের পরিচয় পাই। এই উপন্যাসের একজন কাপালিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তিনি তান্ত্রিক। এই তন্ত্র সাধনা করার জন্য তার নরমাংসের প্রয়োজন পড়ে। এই তন্ত্রসাধনার জন্য কাপালিক নবকুমারকে বধ করতে চায়। তার হাত-পা বেঁধে বধ্যভূমিতে ফেলে রাখেন। কিন্তু যখন কাপালিক তাকে বধ্যভূমির দিকে নিয়ে যান তখন কপালকুণ্ডলা তাকে ইশারায় নিষেধ করেছিল-

'ভৈরবীর পূজায় তোমার এই মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক।'[৬]

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য গুলোতেও তন্ত্রসাধনার একটা দিক ছিল। কোথাও নরবলির ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে । মঙ্গলকাব্যে এই তন্ত্র সাধনার পরিচয় পাওয়া যায় ' এই তন্ত্র ধর্ম প্রবণতা ও তান্ত্রিক সংস্কার বাঙালির মজ্জাগত বলেই বাংলা মঙ্গলকাব্যের দেবী চরিত্রগুলি তন্ত্রোক্ত তত্ত্বের আলোকেই অভিব্যক্ত হয়েছে ... দেবী চরিত্রগুলি তান্ত্রিকতার আলোকেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েই কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে।'[৭]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' উপন্যাসটিতে মধ্যযুগীয় উপাদানের নবনির্মিত ঘটেছে। এখানে চাঁদ সওদাগর মত্যের মাটিতে নেমে এসেছেন। চাঁদ সওদাগর লখিন্দরের লোহার বাসর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ধন্বন্তরিকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাকে ফাঁকি দিয়ে কালনাগিনী তার পুত্রের প্রাণ হরণ করে নেয়। ফলে চাঁদ রেগে যায়।- 'বাসর ঘরের লোহার দেওয়ালে কামিলে রেখেছিল। ছিদ্র .... সেখানে গিয়ে ধরলে নিজের মূর্তি।... লাথি মারলে চাঁদ। হিন্তালের লাঠি দিয়ে দিলে খোঁচা। শিব বৈদ্য জাগতেই তাকে বললে - তুই নেমকহারাম। তুই বিশ্বাসঘাতী..... পথ না দিলে পথ পায় কি করে নাগিনী।'[৮] উপন্যাসে আমরা দেখি চাঁদ লখিন্দরের এর মৃত্যুর জন্য পাহারাদারদের দায়ী করেছে। চাঁদ সওদাগর বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে তা মূল্যায়ন করেছেন। এখানে তার চরিত্রের নবনির্মাণ লক্ষ করা যায়।

অভিজিৎ সেনের 'দেবাংশী' উপন্যাসে আমরা মধ্যযুগীয় বিশ্বাস সংস্কার গুলো দেখতে পাই। বিশ্বাস সংস্কারের বশীভূত সাধারণ মানুষ। 'দেবাংশী' সারবানের কাছে মানুষ নানা সমস্যার সমাধান চায় কিন্তু বাস্তবের জটিল সমস্যার সমাধান দিতে পারে না সারবান বলে - ' জমিনের দখল ছাড়বু নাই সেতু মন্ডল উচ্ছেদ করব। চালে মাত্ত বিষহরির নামেৎ বাধা দিমু।'[৯]

অভিজিৎ সেনের 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর' উপন্যাসেও মধ্যযুগীয় উপাদানের নবরূপায়ণ ঘটেছে। উপন্যাসে এসেছে নানা কিংবদন্তী উপন্যাসের প্রসঙ্গ। মায়নোমতি তার সন্তানের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। কেননা নিঃসন্তান মায়নোমতি কালির থানে মানত করেই তার সন্তানকে পায়। সে কালীর স্থানে মাথা কুটে রক্তাক্ত হয়েছে।

মহেশ্বতাদেবীর উপন্যাসেও আমরা মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগ দেখতে পাই। মহেশ্বেতাদেবীর ' ব্যাধখণ্ড' উপন্যাসটিতে আমরা মুকুন্দরামের জীবনের পরিচয় পাই। সাত পুরুষের ভিটা ছেড়ে মুকুন্দ আরড়া নগরে এসে পৌঁছান। এখানে তার কোন কিছুই অভাব নেই। ধান হাল গরু সবই তাকে দিয়েছেন ভূস্বামী বাঁকুড়া রায়। রানী স্বয়ং এসে মুকুন্দের স্ত্রীকে সাধ খাওয়ায় । এদিকে ফুল্লরা চরিত্রটি মধ্যে নবনির্মাণ ঘটেছে। ফুল্লরা এক প্রাণচঞ্চল যুবতী। সে স্বামীর হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। হাটে মাংসের পসরা নিয়ে যায় ।

ফুলি কাল্যার জন্য আমানি রেখে দেয়। কাল্যাকে সে কাজ করে খাওয়ায়। তারা অভয়া চণ্ডীর জঙ্গলে সন্তান বলে বিশ্বাস করে। ফুল্লরার ভালোবাসা আমাদের চন্ডীমঙ্গলের কালকেতুর ভালবাসাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। উপন্যাসে আমরা চন্ডীমঙ্গলের রচয়িতা মুকুন্দরামকে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে দেখতে পাই। 'ব্যাধখন্ড' এর নায়িকার সাথে মুকুন্দরাম যেন ওতপ্রোতভাবে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ফুল্লরা মুকুন্দের বাড়িতে এসে হাজির হয়। মুকুন্দর বউ তাকে খুব ভালবাসে। এখানেই উপন্যাসের নবনির্মিতর সার্থক রূপ ফুটে উঠেছে। ফুলির ঘরে অভাব। ঘরে অন্ন আসবে কোথা থেকে তাও সে জানেনা। সনার ঘর থেকে সে ক্ষুদ্র ধার চায়। এতে আমাদের চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরা কথা আমাদের মনে আসে।

'ফুল্লরা দুকাঠা খুদ মাগিল উধার
কালি দিব বলি সই কৈলা অঙ্গীকার '[১০]

'কবি বন্দঘটাগাত্রিতর জীবন ও মৃত্যু' উপন্যাসে ও মহাশ্বেতাদেব মধ্যযুগীয় চূয়াড় জাতিকে তুলে ধরেছেন। চূয়াড় যুবক কলহন। সে লেখাপড়া শিখে অভয়ামঙ্গল পাঁচালী রচনার জন্য গর্গরাজার সভায় উপস্থিত হয়। তার পাঁচালীর রচনার দৈবাদেশ চন্ডীমঙ্গলের মুকুন্দের দৈবাদেশের মতই। পথক্লান্ত কলহন দেবীর আদেশের কথা বলেন। যদিও এই স্বপ্নাদেশ সত্যিকারের নয়। কলহন উচ্চ সমাজে নিজের কবি প্রতিভা ফুটিয়ে তোলার জন্যই মিথ্যে বলেছিলেন। উপন্যাসের মাধব চরিত্রটির সঙ্গে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কিছুটা মিল দেখা যায়। দুজনেই পথের মধ্যে দুর্দশাগ্রস্ত হন। তাদের শিশুপুত্রের মুখে আহার তুলে দিতে দুজনেই অসমর্থ। কিন্তু চারিত্রিক দিক থেকে একেবারে আলাদা। মাধব ক্রুর প্রকৃতির, শুধু স্বার্থের ফন্দি আটতে জানে।

'আঁধার মানিক' উপন্যাসেও আমরা মধ্যযুগীয় রীতিনীতির পরিচয় পাই। মহাশ্বেতা দেবী মধ্যযুগীয় কৌলিন্য প্রথার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন । কুলীন কন্যা বধূদের যাবতীয় দুর্দশার চিত্র উপন্যাসটিতে এঁকেছেন। আঁধারমানিক উপন্যাসটিতে বাল্যবিধবা ও বহুবিবাহের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড়শ্রী খণ্ড' উপন্যাসটিতে মধ্যযুগের চিহ্ন ধরা পড়ে। টেপীর মা চাল ব্যবসায়ী। টেপী দেখতে খুব সুন্দরী হয়েছে। তার সৌন্দর্যের তুলনা দিতে গিয়ে ভাসান পালা গান বেহুলার প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন লেখক।

'টেপিই বটে। কিন্তু চেনা অসম্ভব। চালওয়ালির টেপির মায়ের টেপি নয়, এজন্য কোন ভাসান পালা গানের বেহুলা'[১১]

এই উপন্যাসে চৈতন্য সাহা নামক একটি চরিত্র দেখতে পাই। এখানে নামের চৈতন্যদেবের নামের সঙ্গে একটা মিল আছে। তবে চৈতন্য একজন মজুতদার। সে অতিরিক্ত ধান মজুত রেখে সাধারণ মানুষের ক্ষতি সাধন করেছে। ফলে সাধারণ মানুষ হাহাকার করেছে উপন্যাসে। সুরতুনের রান্নাকে বেহুলার রান্নার সঙ্গে তুলনা করেছে হারমোনিয়ামওয়ালা।

অমিয়ভূষণ মজুমদার 'মধু সাধুখাঁ ' - উপন্যাসটিতে আমরা মধ্যযুগীয় উপাদানের পরিচয় পেয়ে থাকি। মধু সাধুখাঁ, জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তার বাণিজ্যে মধ্যযুগীয় পরিবেশ ফুটে উঠেছে। আমরা দেখি এক ফিরিঙ্গী তার নৌকায় ঠাঁই নিয়েছে। সমকালীন বাংলার চিত্র। তারা যখন নৌকা ভ্রমন করে তখন এক সতীকে জোর করে পোড়ানোর ঘটনা দেখেছেন। এই সতীদাহের বর্ণনা অমিয়ভূষণ তার লেখায় তুলেছেন। সতীদাহের মতো নির্মম ঘটনা বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের ইতিহাসের তা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এই সতীদাহের দৃশ্য দেখে সেই ফিরিঙ্গি অবাক হয়ে যায়। বিভিন্ন ধর্মের সম্পর্কে আলোচনা

করে। তাদের দেশের ডাইনি হত্যার ব্যাপারে বিশ্লেষণ করেন। বিভিন্ন তন্ত্রসাধনার সম্পর্কে আলোচনা উঠে এসেছে। এই তন্ত্র সাধনা তো মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই নিহিত আছে । মধু সাধুখাঁ তার নৌকার আশ্রিত ফিরিঙ্গিকে ছেলে ধরা ও মেয়ে চুরি করা হার্মাদ ভেবেছিল। কেননা মধ্যযুগের বিদেশীরা বাংলাদেশের জলপথে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত। নদীর তীরবর্তী এলাকার মানুষ এইসব পতুগীজ, ফিরিঙ্গিদের ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কেননা তারা নারীদের উপর জুলুম চালাত। ধর্ষণ ও ক্রীতদাসে পরিনত করা হতো। বিদেশে বিক্রি করা হতো।

> - 'বাংলার মানুষ পর্তুগিজদের সঙ্গে পরিচিত হতে শুরু করে। সে পরিচয় সুখকর নয়। পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার বাংলার জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।'[১২]

তাছাড়া উপন্যাসে রয়েছে মধ্যযুগীয় বাতাবরণের কুচবিহারের বর্ণনা। রাজাদের রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা আছে। রাজা শুক্লধ্বজের বর্ণনাও স্থান পায় । যিনি মধ্যযুগীয় দিগ্বীজয়ী রাজা ছিলেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারে চাঁদবেনে উপন্যাসটিতে মধ্যযুগীয় উপাদানের প্রয়োগ দেখা যায়। চাঁদবেনে চরিত্রটি মনসামঙ্গল কাব্যের একটি বিখ্যাত চরিত্র। যে কখনো নারীদেরী কাছে হার মানতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হার অনিচ্ছা সত্ত্বেও হার মেনেছে। বাংলা সাহিত্যের তার অনমনীয় ও দৃঢ় চরিত্রটি স্মরণীয় হয়ে আছে। উপন্যাসের এই চরিত্রটির মধ্যে আমরা সে ও নমনীয় ও দৃঢ় রূপটি দেখতে পাই কেননা। উপন্যাসে চাঁদবেনের পিতা তার বাণিজ্যের নৌকো হারিয়ে হতাশায় ভুগছিলেন। এই হতাশা থেকে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু চাঁদবেনে যখন বাণিজ্যের হাল ধরে, তখন বিপুলভাবে তার উন্নতি লক্ষ করা যায় ।

সে তার পিতার আমলের হারিয়ে যাওয়া নৌকো ফিরে পায়। নিজেও একের পর এক নৌকা তৈরি করেন। এখানে কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার মধ্যে চাঁদবেনের সাযুজ্য রেখেছেন লেখক। মঙ্গলকাব্যে চাঁদবেনে কখনও তার স্ত্রী সনকাকে নিয়ে সমুদ্রে বাণিজ্য করতে বেরোয় নি। কিন্তু উপন্যাসে আমরা দেখেছি চাঁদবেনে সনকাকে নিয়ে বহির্দেশে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছেন। সমুদ্রে প্রবল ঢেউয়ে তার বাণিজ্যতরী ডুবে যায়। সেখানে চাঁদবেনে তার সনকাকে হারায়, নিজে কোনমতে বেঁচে থাকে। সেই প্রচন্ড ঝড়ের দাপটে সমস্তই তিনি হারান । তবুও বিশ্বাস রাখেন সনকা কোথাও আছেন । তারপর তিনি মণি-মুক্তার দেশে হাজির হয়ে যান। সেখানে গিয়ে বৌদ্ধ শ্রমনদের সঙ্গে তার দেখা হয়। সেখানকার রাজকন্যা সঙ্গে তার বিবাহ সবই চরিত্রটিতে নতুনত্ব এনেছে। এক ভৈরবী সনকাতে রূপান্তরিত হওয়ার মতো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। তার বাণিজ্যের সম্ভারের মধ্যে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন মনি মুক্তা, বস্ত্র প্রভৃতি। তিনি তাঁতিদের নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে উল্কাপাতে তার মৃত্যু দেখানো হয়েছে। প্রকৃতির কাছে তিনি হার মেনেছেন। আধুনিককালের কবি ও সাহিত্যিক মধ্যযুগীয় উপাদানগুলো তাদের লেখায় নতুন ভাবে তুলে ধরেছেন। কখন তা হয়ে উঠেছে কাহিনীর পটভূমিকা কখনও বা চরিত্র। তারা মধ্যযুগীয় উপাদানগুলো প্রয়োগ করে মানুষের মূল্যবোধ ও দায়িত্ব জ্ঞানকে সজাগ করেন। এই প্রতিবাদী চরিত্রগুলোর মানুষের মনকে সহজে নাড়া দিতে পারে। তাই তারা তাদের রচনায় মধ্যযুগীয় উপাদানগুলো সার্থক রূপে প্রয়োগ করে চলেন।

তথ্যসূত্র:

১) ভট্টাচার্য শ্রী বসন্তকুমার, মিত্র, কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত 'পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল' কলিকাতা চতুর্থ সংস্করণ ১৩৪২ পৃষ্ঠা ২০।

২) চক্রবর্তী ঘনরাম কবিবর প্রণীত ১৯৮ নং বহু রাজার স্ট্রীট, প্রকাশিত ১২৯০ সাল, পৃষ্ঠা ৪৮।

৩) বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' মর্ডাণবুক এজেন্সি কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬পৃ: ২১১।

৪) ড. গিরি সত্যবতী ড. মজুমদার সমরেশ, রত্নাবলী ৫৫ডি কলকাতা প্রথম খন্ড, প্রকাশ ফাগুন ১৪০৩/ মার্চ ১৯৯৭ পৃ:৩৮৭।

৫) বন্দোপাধ্যায় অসিত কুমার 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' মর্ডাণবুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬পৃ: ১৩৯,১৪০।

৬) চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা' কলিকাতা নতুন সংবত ১৯২৩ পৃ:২৩।

৭) ভট্টাচার্য্য ড.জ্ঞানেন্দ্র নাথ 'প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তন্ত্রের প্রভাব' গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন কলকাতা ৭০০০০৬, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৪ পৃ:১৯৭।

৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা ৬ ১৯১৯ পৃ: ৩১,৩২।

৯) সেন অভিজি দেবাংশী দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭৩ প্রথম প্রকাশ ১৯৯০ পৃ:১০।

১০) সরকার সৌমেন্দ্রনাথ 'মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল', গ্রন্থ বিকাশ ৯/৩ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা ৭০০০০৯ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৫ই আগস্ট ২০০০ পৃ:৭২।

১১) পাইন তরুণ মজুমদার অপূর্ব জ্যোতিষ মজুমদার 'অমিয়ভূষণমজুমদার রচনাসমগ্র' দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০৭৩ পৃ:৩২ ,৩৩।

১২) ড. গিরি সত্যরতী ড. মজুমদার সমরেশ সম্পাদনা প্রবন্ধ সঞ্চয়ন প্রথম খন্ড রত্নাবলী কলকাতা ৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশক ফাগুন ১৪০৩/মার্চ ১৯৯৭ পৃ:১১৫।